ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ৪৩-৫৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4213

ঔপনিবেশিক বাংলার বাবু শ্রেণি: সামাজিক গতিশীলতা, ক্ষমতা ও পরিচয়ের নতুন রূপ

ফোরকান আহমেদ
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Following the establishment of the East India Company's colonial rule in Bengal, Kolkata emerged as the central hub for trade, commerce, education, and administration. The socio-economic transformations induced by colonial policies, such as the Permanent Settlement and the spread of English education, prompted a significant migration of people to the city in search of better financial opportunities, resulting in widespread social mobility. From this shifting in social structure, a new elite class, known as the Babu, emerged. The Babu class represented a unique amalgamation of Western education, economic prosperity and cultural reformation, and played a pivotal role in shaping the cultural, economic, and social spheres of Bengal. Their rise was deeply rooted in the power dynamics of colonial rule, where they consolidated their status through both economic control and cultural influence. Many researchers and literary figures have conducted studies on Kolkata and the Babu class. Most of these studies have focused on the culture of the Babus, often interpreting it negatively and emphasizing their indulgence in luxury. This study aims to address this gap. In addition to analyzing their cultural and ideological framework, this article will explore the rise of the Babu class as part of social mobility. Their dual role as agents of modernization and enforcers of colonial power highlights the complexities of social mobility and elite formation in colonial Bengal.

Key Words: Babu Class, Social Mobility, English Education, Cultural Reformation, Elite Theory.

উপনিবেশ আমলে সরকারের রাজস্বনীতি, শিক্ষার প্রসার, প্রশাসনে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পুঁজিবাদের সাথে বাংলার সংযোগের ফলে সমাজে পূর্বের শ্রেণিগত বিন্যাসে পরিবর্তন দেখা যায় যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সামাজিক গতিশীলতা (Social Mobility)। উনিশ শতকে বাংলার সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কলকাতার বাবু শ্রেণি। এই শহরের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে বাবু শ্রেণির উত্থান ঘটে। বাবু শ্রেণি তাদের আর্থিক সচ্ছলতা, প্রশাসনে সংশ্লিষ্টতা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণসহ বিভিন্ন উপায়ে সমাজে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

স্বপন বসু, বিনয় ঘোষ, শ্রীপান্থ, মৃণালিনী সিনহা, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদারসহ অনেক গবেষক বাবু শ্রেণি সম্পর্কে লিখেছেন। এ লেখাগুলো অধিকাংশই বাবুদের উত্থান এবং তাদের সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কিত বিবরণ। কেউ কেউ ঔপনিবেশিক শাসনে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে বাবুকে অঙ্কিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তসহ অনেকের লেখায় বাবুদের সম্পর্কে জানা যায়। সাহিত্যিকগণ প্রায়ই বাবুদের সংস্কৃতি ও বিলাসিতার গল্পই বলে গিয়েছেন।

বাবুদের বিলাসিতা কিংবা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণের পশ্চাতে বাবুর মনস্তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে দেখানো হয়নি। তাদের উত্থান ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ শুধু বিলাসিতা এবং দুর্বৃত্ত সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে দেখার চেয়ে ক্ষমতার সম্পর্ক (Power Relations) দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা জরুরি।

এই প্রবন্ধে বাবুদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম, চিন্তা ধারা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পেছনে বাবুর স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, বিশেষত 'এলিট' তত্ত্বের আলোকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এক্ষেত্রে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রূপান্তর এবং বাবুদের উত্থান প্রসঙ্গে বিবরণ দেয়া হবে। বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণার গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে উনিশ শতকের জনশুমারি প্রতিবেদনসমূহ, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পরিসংখ্যান এবং বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এলিটিজম

উনিশ শতকে 'বাবু' শ্রেণি বাংলার সমাজে একটি বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাবুদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও মনস্তত্ত্ব এলিট তত্ত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, এলিট কোনো শ্রেণি নয়, বরং একটি বিশেষ শ্রেণিবিন্যাস বা ক্যাটাগরি, যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে।[১] এলিটরা সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ হলেও তাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কিছু পর্যবেক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

- এ স্কুল আধুনিক সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারা। ভিলফ্রেডো পেরেটো (১৮৪৮-১৯২৩), গেটানো মোসকা (১৮৫৮-১৯৪১) এবং রবার্ট মিশেল (১৮৭৬-১৯৩৬) এ তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। এটি পরবর্তীকালে পশ্চিমা এলিট তত্ত্বের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পেরেটো মনে করেন এলিটরা সমাজের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে (সামরিক, অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক) নেতৃত্ব

দেয়। তিনি এলিটদের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি দুই ধরনের এলিটের কথা বলেছেন:

> …. So we get two strata in a population: (1) A lower stratum, the non-Elite, with whose possible influence on government we are not just here concerned; then (2) a higher stratum, the elite, which is divided into two: (a) a governing elite; (b) a non-governing elite.[২]

- গেটানো মোসকার 'শাসক শ্রেণি তত্ত্ব' মতে, প্রতিটি সমাজেই একটি শাসক গোষ্ঠী থাকে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর শাসন করে। তিনি এলিটদের সংগঠিত সংখ্যালঘু হিসেবে দেখেছিলেন, যেখানে সাধারণ জনগণ একটি অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ।

> … the ruling class or, rather, those, who hold and exercise the public power, will be always a minority, and below them we find a numerous class of persons who do never, in any real sense, participate in Government but merely submit to it: these may be called class.[৩]

- এলিট শ্রেণি সময়ের সাথে সাথে নানা কারণে পরিবর্তন হতে পারে।[৪] গবেষকগণ এলিটদের মধ্যে কয়েকটি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ: রেমন্ড অ্যারন পাঁচ ধরনের এলিট ক্যাটাগরির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: রাজনৈতিক নেতা, সরকারি প্রশাসক, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, জনসাধারণের নেতারা (যেমন ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠনের নেতা) এবং সামরিক প্রধানরা।[৫] শিল্পায়নের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পাঁচটি আদর্শ ধরনের এলিট শ্রেণি রয়েছে যারা প্রথাগতভাবে এবং বিভিন্নভাবে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করে: (ক) রাজবংশীয় অভিজাত (খ) মধ্যবিত্ত (গ) বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী (ঘ) ঔপনিবেশিক প্রশাসক (ঙ) জাতীয়তাবাদী নেতা।[৬]

বাবু এবং তৎকালীন ভদ্রলোকেরা সমাজে নিজেদের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেছেন। বাবুরা প্রায়শই পূজা-পার্বণে বিপুল অর্থব্যয়ে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিপত্তি ও সামাজিক অবস্থান প্রদর্শন করতেন। ভদ্রলোকদের একটি অংশ বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড- যেমন সাহিত্যচর্চা, সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সমাজ সংস্কারমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদা (Social Status) প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত পরিচিতির গণ্ডি পেরিয়ে উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক প্রবাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবার বলেছেন, আধুনিক সমাজে ক্ষমতা একাধিক রূপে পাওয়া যায় যেখানে শ্রেণির পাশাপাশি মর্যাদা (Status) এবং সম্পদও গুরুত্বপূর্ণ। গণমানুষের সঙ্গে তাদের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, এলিটরা তাদের শক্তি ধরে রাখে এবং শাসক শ্রেণির সংস্কৃতিকে পুনরায় তৈরি করে। তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং নীতি ও মতাদর্শ প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। তারা সম্পদ, শিক্ষা, শিল্প এবং বড় কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করে।[৭]

সামাজিক গতিশীলতা ও নতুন শ্রেণির উদ্ভব

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আগে সমাজ বিন্যাস বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, অর্থনীতি এবং সর্বোপরি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের ভিত্তিতে একটি স্তরভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছিল।[৮] এই সমাজ কাঠামো মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-কানুন দ্বারা পরিচালিত হতো। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান তার জন্মগত পরিচয় দ্বারা নির্ধারিত হতো।[৯] ব্রিটিশ শাসনামলে অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্বের ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সমাজ কাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অর্থ-বিত্তকেন্দ্রিক শ্রেণিবিভাগ সমাজে প্রাধান্য লাভ করে।[১০] ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর সমাজ বিন্যাসের রূপান্তর ঘটে এবং নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়। এ সময় শিক্ষা, চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলার সমাজ কাঠামোতে নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।[১১] এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়, তেমনি জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে গোমস্তা, দালাল, মহাজন, ইজারাদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়। তারা ভূমি ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[১২]
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের কারো কারো সমৃদ্ধি আসলেও রায়ত শ্রেণির ভাগ্যে শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটেনি, বরং বেড়েছে। একদিকে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধে বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে উৎপাদনের তুলনায় বেশি রাজস্বের চাপের ফলে রায়তরা নগরকেন্দ্রিক আয়ের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। নগরে নানা ধরনের ক্ষুদ্র পেশার সাথে তারা যুক্ত হলে নগরকেন্দ্রিক একটি নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় অসংখ্য মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাতে শুরু করে।[১৩] তারা পারিবারিক ভৃত্য, কুলি, মজুর, দপ্তরি ইত্যাদি পেশায় যুক্ত হয়। ফলে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজের জন্য শুরু থেকে একদিকে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে রাজধানী কলকাতায় ইউরোপীয় অফিসার ও কর্মচারীদের সংখ্যা।[১৪] অন্যদিকে বাড়তে থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা নানান শ্রেণি পেশার মানুষের সংখ্যা।

কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

বছর	জনসংখ্যা
১৭১০	১২,০০০
১৭৫২	২,০৯,৭২০
১৭৯৬	৫,০০,০০০
১৮০২	৬,০০,০০০
১৮১৪	৭,০০,০০০

উৎস: বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*।[১৫]

- ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তেলি, সাহা, বসাক, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়।[১৬] এরা উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। ফলে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে

ওঠে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও একটি নতুন মর্যাদা অর্জন করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই শ্রেণি মোট জাতীয় আয়ের ৮১ শতাংশের মালিক হয়ে ওঠে।[১৭] ১৮৫০ সালে কলকাতা শহরে একতলা পাকাবাড়ির সংখ্যা ছিল ৫৯৫০, দোতলা ৬৪৩৮, তিনতলা ৭২১, চারতলা ১০, পাঁচতলা ১। ১৯০১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২১৭৫, ১২৯৭৬, ৩১০৪, ২৯৮, ২১। ১৮৯১ সালে সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মোট লোকসংখ্যার ৪৮ শতাংশ ছিল শহরবাসী।[১৮]

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের পরে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যার ফলে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৯] রায়ত-জমিদার দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ শ্রেণিগত বিরোধের কারণে আইনি পেশার চাহিদা বাড়ে। ফলে উকিল, মুন্সেফ, আমিন প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণির উত্থান ঘটে। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনি ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দেওয়ান রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানে লিখছেন, "In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary."
- সরকারি চাকরিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সদর আমিন, মুন্সেফ প্রভৃতি পদে ভারতীয়দের নিয়োগ মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটায়। কর্নওয়ালিসের পুলিশ ব্যবস্থায় দারোগা ও সিপাহিদের নিয়োগ স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এই নব্য নিযুক্ত দেশীয় কর্মচারীগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়।[২০] চাকরি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে ৫,৩৭,৮১১ জন ইংরেজি জানত এবং ১৮৮৬-১৮৯১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১৫,২০০ জন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশ নিত। কলকাতায় পাশের হার ছিল ৪৭.৭৪%, যা মাদ্রাজের ২৬.৮৭% তুলনায় অনেক বেশি।[২১] পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বাংলায় একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করে। এই পরিবর্তনগুলি বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে এবং আধুনিক বাংলার ভিত্তি রচনা করে।

যখন গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নগরমুখী হতে শুরু করল তখন তাদের শূন্য স্থান দখল করে নিল ভূমি ও প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এর ফলে গ্রামীণ সমাজে একদিকে জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, গোমস্তা, দারোগা, পাইক, পিওন, শিক্ষক প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যদিকে চৌকিদার, দফাদার, কনস্টেবল, তাদের ভৃত্য ও অনুগ্রহজীবী নিম্নবিত্ত শ্রেণিও তাদের অবস্থান গড়ে তোলে। এই পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজের শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবিকা, উৎসব, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদিরও রূপান্তর ঘটে।[২২]

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সামগ্রিকভাবে দেখলে এই পরিবর্তন সব দিক দিয়েই গ্রামীণ সমাজের অবনতি ঘটিয়েছে। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ভেঙে পড়তে শুরু করে, যা গ্রামীণ জীবনের গুণগত মানকে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সুবোধ

কুমার মুখোপাধ্যায় নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে নতুন সামাজিক গোষ্ঠীকে ব্যাখ্যা করেছেন। মুখোপাধ্যায়ের মতে, নতুন সামাজিক গোষ্ঠী শুধু একটি অর্থনৈতিক শ্রেণি নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীও বটে।[২৩] মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী, শ্রেণি নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থায় কার কাছে উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পদ রয়েছে তার ভিত্তিতে। অন্যদিকে, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, শ্রেণি নির্ধারণে পেশাগত দক্ষতা, সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং জীবনযাপনের ধরনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের জীবনযাপনের ধরন, ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য সামাজিক আচরণের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় ও মর্যাদা গড়ে তোলে।

বাবু শ্রেণির উত্থান

বাবু শ্রেণিকে গবেষকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণিকে মধ্যবিত্ত হিসেবে দেখেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপান্থ সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি হিসেবে অভিহিত করেছেন। গবেষকগণ এদেরকে "ভদ্রলোক" শ্রেণি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও, জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং আর্থিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা প্রায় একই রকমের শ্রেণিভুক্ত।

নবাব আমলে 'বাবু' শব্দটি শুধু সম্মানিত এবং ধনী ব্যক্তিদর জন্য ব্যবহৃত হতো। ইংরেজ আমলে এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। 'বাবু' শব্দটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। নতুন ধনী শ্রেণি তখন 'বাবু' হিসেবে পরিচিতি পায়। শ্রীপান্থ বাবুদের আর্থিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তারা সাধারণ বাঙালির মতো ছিলেন এবং সুতানটি বন্দরে জাহাজের কাপ্তানদের সাথে যোগাযোগের জন্য দোভাষীর ভূমিকা পালন করতেন। এদের অনেকেই চাকরি, ব্যবসা এবং জমিদারি পরিচালনা করতেন এবং অবৈধ উপায়েও অর্থ উপার্জন করতেন। বাবুদের অনেকের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও ঘুষের অভিযোগ ছিল।[২৪]

কলকাতাকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ বাবু শ্রেণির উত্থানের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জমিদারির পাশাপাশি লাভজনক বাণিজ্য এই শ্রেণির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কলকাতা বন্দরে বিদেশি জাহাজের ভিড় এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা শহরটিকে একটি বৈশ্বিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।[২৫] গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টায় উৎপাদিত পাট, আসাম থেকে উৎপন্ন চা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কৃষি ও খনিজ সম্পদ যেমন পাট, তুলা, ধান, গম, ভুট্টা, কয়লা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি কলকাতা বন্দর দিয়ে বিশ্বব্যাপী রপ্তানি করা হতো।[২৬] সমসাময়িককালে ক্রমবর্ধমান

বাণিজ্যের চিত্র থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাবুরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছিলেন।

কলকাতায় বিদেশি জাহাজ নোঙ্গরের পরিসংখ্যান

সাল	জাহাজ	মোট পণ্য (টন)
১৭৭০	৯৫	২৩,৮৩১
১৭৭১	৮১	২৫,০৭০
১৭৭২	১১৫	২৬,১৮৪
১৭৭৩	১৬১	৩৭,০৩৭
১৭৭৪	১৪৭	৪৩,৯৩৫

উৎস: *Proceedings of Council, 22 April 1775*.[২৭]

কলকাতা থেকে তুলা দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির হিসাব

বছর	তুলার রপ্তানি মূল্য (সিক্কা টাকায়)	ইংল্যান্ড থেকে আমদানি তুলার মূল্য (সিক্কা টাকা)
১৮১৭-১৮	১,৩২,৭২,৮৫৪	১১,২২,৩৭২
১৮১৯-২০	৯০,৩০,৭৯৬	১৫,৮২,৩৫৩
১৮২৩-২৪	৫৮,৭০,৫২৩	৩৭,২০,৫৪০
১৮২৬-২৭	৩৯,৪৮,৪৪২	৪৩,৪৬,০৫৪
১৮২৯-৩০	১৩,২৬,৪২৩	৫২,১৬,২২৬
১৮৩২-৩৩	৮,২২,৮৯১	৪২,৬৪,৭০৭

উৎস: Major B.D. Basu, *Ruin of Indian Trade and Industries, 52-53.* [২৮]

ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল থেকে ১৮৫২ সালে শুধু কলকাতায় ৬,৫৯৫ টন কয়লা রপ্তানি হয়েছিল। যেখানে বোম্বেতে ২,১৮৯ টন, শ্রীলঙ্কার সিলোনে ৫,৪৯০ টন, লিসবনে ৭,৪১৬ টন, নিউইয়র্কে ৭,৪২৫ টন, উড়িষ্যায় ৪,১৫৫ টন, ফিলাডেলফিয়ায় ৫,৭৮৭ টন এবং স্টকহোমে ৫.৮৫৯ টন কয়লা রপ্তানি হয়েছিল।[২৯]

কলকাতায় বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণিও বাবু শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনও এই শ্রেণির উত্থানে ভূমিকা রাখে। সমসাময়িক সাহিত্যসহ গবেষণা গ্রন্থগুলোতে এ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, তাঁর বাল্যকালে এক প্রতিবেশি হাইকোর্টে চাকরি করতেন যার মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১৫ টাকা, অথচ সাংসারিক ব্যয় ছিল অন্তত ২০০ টাকা। এছাড়া বহু স্বর্ণালংকার ও স্থাবর সম্পত্তি তো আছেই। উনিশ শতকে এই শ্রেণির লোকের সংখ্যা অনেক যাদের আয় ও সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩০]

উনিশ শতকের উদীয়মান এই বিত্তবান শ্রেণির অনেকেই একই সাথে বিভিন্ন পেশা ও নগরকেন্দ্রিক ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনীতে এই পরিবর্তনের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তিনি ১৮১০ সালে গ্রাম থেকে কলকাতায় ভাগ্য

পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। প্রথমদিকে মাত্র দুই টাকা বেতনে একটি দোকানে চাকরি পেয়ে পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন।[৩১] দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ অনেকেই একসাথে বহুবিধ লাভজনক পেশার সাথে থেকে নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন। যেমনঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিকে জমিদার, অন্যদিকে কোম্পানির শুল্ক, লবণ ও আফিম বিভাগের কর্মকর্তা এবং দালাল হিসেবে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থেকে সম্পদ বাড়িয়েছেন বহুগুণ।[৩২]

আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এ শ্রেণির হাতে উদ্বৃত্ত ছিল প্রচুর নগদ অর্থ। তারা এই অর্থ বিনিয়োগ করেছিল জমিতে। কারণ এটি ছিল সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। আর্থিকভাবে বিত্তশালী ও শিক্ষিত এ শ্রেণি থেকে পরবর্তী সময়ে উদ্ভব হয় সমাজের ভদ্রলোক, বাবু ও বুর্জোয়া শ্রেণি। এই নতুন শ্রেণি ব্রিটিশ প্রশাসনের সুবিধাভোগী। তাদের প্রভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। মননে, চিন্তায় ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এদের হাত দিয়েই শুরু হয়।[৩৩]

বাবু শ্রেণির সংস্কৃতি

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ছায়ায় কলকাতার বাবু সংস্কৃতি ছিল একটি জটিল সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং আভিজাত্যের প্রতীক। এ সংস্কৃতির একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, অন্যদিকে জাতীয় চেতনার সংকট।[৩৪] ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে জন্ম নেওয়া এই সংস্কৃতি শিক্ষিত, ধনী ও আধুনিকমনা ব্যক্তিদের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি বিদ্রুপাত্মক অর্থ ধারণ করে, বিশেষত সেইসব ব্যক্তিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত ছিলেন। এই সংস্কৃতি শুধু একটি শ্রেণির পরিচয়ই নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সংকটকেও প্রতিফলিত করে। নিম্নে এর কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলোঃ

- **বিলাসিতা ও ফ্যাশনঃ** বাবুদের জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। তারা বড় বাড়ি, গাড়ি এবং বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করতেন। বাবুদের জীবনযাত্রা ছিল অন্যদের তুলনায় ভিন্নমাত্রার প্রদর্শন। যেমন গঙ্গাস্নানে গোটা সমাজকে জানিয়ে ভেপু বাজিয়ে জমকালোভাবে যাওয়া, বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা উড়িয়ে উৎসব করা, আসর বা অনুষ্ঠানে বহু অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। [৩৫]

  ফ্যাশনেও তারা পাশ্চাত্য ধাঁচের পোশাক পরতেন। তাঁদের পোশাক-আশাকেও থাকত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে নিজেদের সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করার চেষ্টা করতেন। এই বাবুদের পোশাক ও ফ্যাশনের কয়েকটি দিক হচ্ছেঃ (১) পায়ে পেটেন্ট চামড়ার জুতো (২) মাথায় সিল্কের ছাতা (৩) মনে আবছা আবছি ইংরেজি ভাবাদর্শ এবং (৪) মুখে 'ten thousand horse-power English words and phrases!'[৩৬]

- **বিনোদন ও আয়েশ:** বাবুরা অনেক বেশি আয়েশি জীবন যাপন করতেন, সাথে ছিল অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার। ভোগ বিলাসের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। শ্রীপান্থ উল্লেখ করেছেন: "বাবু দিনরাত ঘুড়ি ওড়ান, তুড়ি মারেন, আখড়া সাজান এবং উদ্যোগ করে 'বুলবুলাক্ষ্য পক্ষীর যুদ্ধ' দেখান। অষ্টাহে বনভোজনে, তাঁর মন ভরে না। সুতরাং পানসি করে তিনি নদীপথে ভূ-ভ্রমণে বের হন।"[৩৭]
- **পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির অনুকরণ:** বিলেতিদের অনুকরণে বাবুদের ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তীব্র আগ্রহ। কথায় কথায় ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ছিল তাদের কাছে মর্যাদা, আভিজাত্য ও ভাব-গাম্ভীর্যের প্রতীক। ফলে বাবুরা কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন, যদিও তাদের উচ্চারণ ও প্রয়োগ ছিল হাস্যকর। 'নোটের নাম লোট', 'বডি গার্ডের নাম বেণিগরাদ', বা 'লৌরি সাহেব নৌরি সাহেব'-এর মতো উদ্ভট রূপান্তর তাদের কথায় শোনা যেত। তাদের এই প্রয়াস ছিল ইংরেজদের প্রতি অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার কারণে, কিন্তু প্রকৃত ভাষাজ্ঞানের অভাবে তা কার্টুনের মতো রূপ নিত।[৩৮] অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অফিসাররা তাদের সাথে যেরকম অপমানজনক আচরণ করতেন, তারাও একই প্রক্রিয়ায় স্বদেশী সাধারণ মানুষের সাথে দাসসুলভ আচরণ করতেন।[৩৯]

  তারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ক্লাবকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্কৃতি ও উৎসবের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মদ পানের অভ্যাস তৈরি করে রীতিমতো অনেকেই আসক্ত হয়ে পড়েছিল। এই শ্রেণির একটা অংশ ছিল ব্যাভিচারে লিপ্ত। সমসাময়িক পত্রিকায় দেখা যায় কলকাতা নগরীতে মদের ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিন বেশ্যা শ্রেণিও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু যে পুরুষেরা এই পথে গিয়েছে তা নয়, অনেক নারীও এই পথে পা বাড়িয়েছে।[৪০]

  অর্থবিত্তের প্রদর্শনী বাবু ছাড়াও আরেক শ্রেণির বাবু আছেন। শ্রীপান্থের ভাষ্যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ এদের নাম দিয়েছেন 'ভদ্রলোক'।[৪১] নব্য শিক্ষিত এ শ্রেণি সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার পরিবর্তে বেছে নিলেন বিলেতি অনুকরণ। ইংরেজ সান্নিধ্যে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ব্রিটিশ পন্থায় বিদ্যা ও বিত্তবান হলো, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি হিন্দুকে আধুনিক ইউরোপীয় মানুষ রূপে গড়া।[৪২] এ শ্রেণি স্ত্রীদের শিক্ষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, বিধবা বিবাহের উদ্যোগসহ কোথাও কোথাও পৌত্তলিকতার বিপক্ষে অবস্থানসহ নানান ধরনের ধর্মসংস্কারও করেছেন।
- **সাংস্কৃতিক দ্বৈততা ও সংকট:** বাবু সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বৈততা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এটি ছিল উপনিবেশিক আধিপত্যের একটি পরোক্ষ ফলাফল, যেখানে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী আধুনিকতার নামে নিজেদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।[৪৩] বাবুরা যেমন ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় পোশাকে নিজেদের আধুনিক বলে তুলে ধরতেন, তেমনই তাঁরা স্বদেশী বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকতেন। সমাজের শিক্ষিত এই শ্রেণি সভা-সমিতি, পুস্তক, পত্রিকাসহ বিভিন্ন উপায়ে সমাজে একটি স্বতন্ত্র প্রভাব ও মর্যাদার স্থান করে নেয়।

উদাহরণস্বরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮১৪ সাল থেকে রামমোহন কলকাতায় বাস শুরু করলেন, পরের বছর প্রতিষ্ঠা করলেন আত্মীয় সভা। "দেখা গেল আলোচনা সেখানে আধ্যাত্মিক বিষয়ে থাকতে চাইছে না, ভূমার বদলে ভূমিতে নেমে আসছে নিয়মিত।"[৪৪] ১৮১৭ তে হিন্দু কলেজ, ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন', গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট', সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ', ১৮২১ থেকে ১৮২৩ সালে ধারাবাহিক পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা, ১৮২৭-২৮ সালে একাডেমিক এসোসিয়েশন, ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ, ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারক আইন ইত্যাদি। এরকম শিক্ষিত বিত্তশালী আরো অনেকেই পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন সুকুমারবৃত্তির সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ, বিধবা বিবাহ প্রথার পক্ষে আন্দোলন করে সফল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সংগ্রামগুলোতে ছিলেন নীরব।

সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া: বাবু সংস্কৃতি সমকালীন সমাজে প্রশংসার চেয়ে সমালোচনাই বেশি কুড়িয়েছে। বাবু সংস্কৃতি সমকালীন সাহিত্য এবং সমাজে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবু সংস্কৃতির বিলাসিতা ও বিলেতি অনুকরণের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমের রচনায় বাবুরা আত্মমর্যাদাহীন এবং কপট চরিত্রে চিত্রিত হয়েছেন।[৪৫] কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা* এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* রচনায় বাবু শ্রেণির আভিজাত্য প্রদর্শন এবং ব্রিটিশ সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসেও বাবু সংস্কৃতির সমালোচনা করা হয়েছে, যেখানে তিনি এই শ্রেণির আত্মপরিচয়ের সংকট এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

- মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা"-তে বুড়ো কর্তাকে একটি প্রতীকী চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যার আক্ষেপ ও মন্তব্য সেই সময়ের কলকাতার সমাজের নৈতিক স্খলন ও তামসিকতাকে প্রকাশ করে। তার উক্তি, "এ কলকাতা মহাপাপ নগর কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বাস করা উচিত?" সমাজের অবক্ষয় এবং নগরজীবনের সংকীর্ণতার প্রতি তীব্র বিদ্রুপ।[৪৬]
- *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার ভাষ্য, "এই দলভুক্ত ধনি সকল এই দুষ্কর্মের প্রসঙ্গ, আয়োজন এবং উপভোগে সর্বদা মগ্ন থাকেন, এবং ইহার আনুষঙ্গিক অশ্বযানের শোভা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও বিহঙ্গ ক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্তে অপরিমিতরূপে রাশি রাশি ধন ক্ষেপণ করেন।"[৪৭]
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কলকাতার এই সমাজবর্গকে এবং তাদের সাহিত্যিক প্রবণতাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি এ শ্রেণিকে কলকাতার "মাতাল, বাটপার, মনুষ্য-দেহী পশু" হিসেবে অভিহিত করে তাদের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের উপর প্রশ্ন তুলেছেন। চৌধুরী এ শ্রেণির ব্যঙ্গ করে তাদের দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই শ্রেণি একদিকে নিজেদেরকে ভদ্রলোক

হিসেবে দাবি করে আবার অন্যদিকে রায়তদের প্রতি উদাসীন। চৌধুরী মনে করেন যে, এই মধ্যবিত্ত বাঙালির সাহিত্যকর্মও তাদের এই দ্বিচারিতার প্রতিফলন।[৪৮]

বাবু সংস্কৃতি বাংলার সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটি একদিকে যেমন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারে ভূমিকা রেখেছে, অন্যদিকে এটি সমাজে একটি নতুন ধরনের শ্রেণি বিভেদ তৈরি করেছে। বাবু শ্রেণির আভিজাত্য প্রদর্শন এবং ব্রিটিশ সংস্কৃতির অনুকরণ গ্রামীণ সমাজ এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে অসন্তোষেরও জন্ম দিয়েছিল।

বাবু সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার সম্পর্ক

এখন প্রশ্ন হলো: যে বাবু দিন রাত খেটে (বুদ্ধি) অর্থবিত্ত গড়লেন সে বাবু কেন এত বিলাসিতার মাধ্যমে এই অর্থ নষ্ট করছেন? এর উত্তর এলিট তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে। এলিট তত্ত্বের মাধ্যমে দেখলাম ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী কীভাবে রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলে। আমরা পেরেটোর বক্তব্যে দেখেছি এলিটরা সরাসরি শাসনযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, নাও হতে পারে এবং এই এলিট শ্রেণি রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গেটানো মোসকার মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এঁরা সরাসরি সরকারের অংশ না। তারা রাজনৈতিক কোনো গোষ্ঠীও না, কিন্তু সরকারের প্রতি অনুগত থেকে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখে।

উপনিবেশিক আমলে কলকাতার বাবু শ্রেণি শুধু একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শ্রেণিই ছিল না, তারা ব্রিটিশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সমাজে তাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বাবুদের উৎসবগুলো আয়োজনে দেশের প্রধান শাসনকর্তা, প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জানানো হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরযাত্রার পেছনে হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে শোভাযাত্রা করতো। তারা সরকারের সংস্পর্শে থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাবুদের কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের উৎসবগুলোতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ফিরিঙ্গি সবার জন্য খোলা নিমন্ত্রণ থাকত।[৪৯] প্রশ্ন হলো: বাবুর কী প্রয়োজন ছিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে সবাইকে নিমন্ত্রণ করার? আসলে এর মাধ্যমে বাবু খ্যাতি চান। আর খ্যাতি আসার অর্থ সমাজে প্রভাব বিস্তার করা। আমরা এলিট তত্ত্বের অংশে দেখলাম, ম্যাক্স ওয়েবার সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষমতা পাওয়ার ও চর্চা করার একটি মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাবুরা খ্যাতি অর্জনের জন্য নানা নাটকীয় পন্থা গ্রহণ করতেন, যা শ্রীপান্থের বিবরণে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কেউ দান-দক্ষিণার মাধ্যমে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করতেন, কেউবা সোনা-রুপোর কাপ বিলিয়ে খ্যাতি অর্জন করতেন। যেমন, কৃষ্ণনগরের এক জমিদার পলাশির যুদ্ধের মাঠ কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রি করে সেই টাকায় সোনা-রুপোর কাপ বানিয়ে বিলিয়েছিলেন। তাঁর খ্যাতি তখন কলকাতা, চিনসুরা, কৃষ্ণনগর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সাহেব থেকে শুরু করে নর্তকীরা পর্যন্ত সবাই তাঁকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি সমাজে নিজেকে সর্বত্র জাহির করতেন-চাঁদা খাতায় নাম লিখিয়ে, আর্জিতে স্বাক্ষর করে কিংবা সভায় গিয়ে বক্তব্য দিয়ে।[৫০]

বাবুদের অনেকেই প্রশাসনে, আইনসভায় ও নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিলেন।[৫১] কখনো কখনো তারা সরকারের কাছে দলবদ্ধভাবে দাবি-দাওয়া নিয়ে গিয়েছে। যেমন- গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাসির হুকুম রদ করার জন্য তারা দলবদ্ধভাবে আবেদন করেছিল।[৫২] সতি, জুরি প্রথা, সম্পত্তিরক্ষা, প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তারা দাবি দাওয়া উত্থাপন করেছে। বাবুদের কেউ কেউ ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদেও নিয়োগ পেয়েছিলেন। তারা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রেভিনিউ কালেক্টর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করতেন। এই পদগুলি তাদেরকে সমাজে প্রভাবশালী করে তুলেছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের আধিপত্য ছিল স্পষ্ট। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল নাট্যশালা, সাহিত্য সমাজ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। কখনো তারা চেষ্টা করেছেন ছাপাখানার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করে সমমনাদের মধ্যে ঐক্য তৈরির। যেমন- ১৮১৫ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে রামমোহন একাই বই ছাপিয়েছেন বাংলায় ২৯টি, ইংরেজিতে ৩৩টি, সংস্কৃতে ৩টি। তাছাড়া উনিশ শতকের সমস্ত সভা সংগঠনের সাথে ছিল এ শ্রেণির সরাসরি সম্পৃক্ততা।

বাবু শ্রেণির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সমাজে আর্থিক অনুদান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। তারা এসব কাজের মধ্য দিয়ে নিজের উপযোগিতা যেমন বাড়াতে চায়, তেমনিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। সামাজিক অনুষ্ঠানটি সাধারণ চোখে শুধু সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রকাশ হলেও তাদের কাছে এর মাধ্যমে সকলের কাছে নিজেদের সুখ্যাতি, সুনাম এবং পরিশেষে সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করে। মোদ্দাকথা হলো, বাবুরা টাকা উড়িয়ে কিংবা সভা সমিতি করে যেভাবেই হোক চেয়েছিল সমাজে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধরে রাখতে। তাদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে চেয়েছিল সমাজের কাছে খ্যাতি। ক্ষমতার সংস্পর্শে থেকে সরকারের আস্থাভাজন হয়ে সমাজে ক্ষমতা চর্চা করেছে। তাত্ত্বিক কাঠামোতে এলিটদের সামাজিক প্রাধান্যের উনিশ শতকীয় দৃষ্টান্ত এই বাবু শ্রেণি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ T. B. Bottomore, *Elites and Society,* (Baltimore: Penguin Books, 1968),7-24.

২ Vilfredo Pareto, *The Mind and Society-a Treatise on General Sociology*, (New Yok: Dover Publications, Inc., 1935), 1423-1425 (para. 2032 & 2034).

৩ James Hans Meisel, *The Myth Of Ruling Class, Gactana Mosca and the "Elite"*, (Michigan: The University Of Michigan Press, 1958), 32-33.

৪ "In virtue of class-circulation, the governing elite is always in a state of slow and continuous transformation. It flows on like a river, never being today what it was yesterday. From time to time sudden and violent disturbances occur. There is a flood-the river overflows its banks. Afterwards, the new

governing elite again resumes its slow transformation. The flood has subsided, the river is again flowing normally in its wonted bed.” Pareto, Vilfredo. *ibid*, para. 2056.

৫ Raymond Aron, “Social Structure and the Rulling Class”, *British Journal of Sociology*, Vol. 1 (1950), 10.

৬ Kerr Clark, et al. “The Idustrializing Elites and Their Strategies”, in *Industrialism end Industrial Man*, (Cambridge, 1960), 50; cited in Rangalal Sen, *Middle Class Elites Civil Society and other Essays*, Volume 1, (Dhaka: New Age Publication, 2011), 109.

৭ Luis Garrido Vergara, *Elites, Political Elites and Social Change in Modern Societies*, (Chile: Revista de Sociología, Chile, 2013), 31-49.

৮ Sumit Sarkar, *Writing Social History*, (New Delhi: Oxford University Press, 1997), 358-365.

৯ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিবর্তন*, (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯), ৬৩।

১০ প্রাচীন যুগ থেকে বাংলার সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণি বিন্যাসের বিবর্তন সম্পর্কে দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩), ২৬১-২৮১।

১১ Bipan Chandra, *A History of Modern India*, (Hyderabad: Orient Blackswan Private Limited, 2009), 187-190.

১২ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৮), ৩।

১৩ A. K. Bagchi, *Private Investment in India, 1900–1939*, (Cambridge, Cambridge University Press, 1972), 89-112.

১৪ কলকাতায় ইউরোপীয়দের আগমনের সংখ্যা ও জীবনধারা সম্পর্কে জানতে দেখুন, Suresh Chandra Ghosh, *The British in Bengal*, (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1970), 93-175.

১৫ বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, (ঢাকা: বুক ক্লাব, ২০১৫), ৬২।

১৬ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশক, ২০১৪), ৭৪-১৩৮।

১৭ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত*, ১।

১৮ *প্রাগুক্ত*, ৪।

১৯ ডব্লিউ হান্টার, *পল্লীবাংলার ইতিহাস*, (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০২), ২২৭।

২০ W.R. Gourlay, *A Contribution Towards A History of the Police in Bengal*, (Bengal Secretariat Press, 1916), 13-66.

২১ *Census of India*, 1891, 224.

২২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ১৯৭১), ২৫৪।

২৩ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত* , ১-৫।

২৪ শ্রীপান্থ, *কলকাতা*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ), ৩০১।

২৫ ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ৫৬।

২৬ Parimal Ghosh, *Colonialism, Class and a History of the Calcutta Jute Millhands 1880-1930*. (Hyderabad, Orient Longman, 2000), 1-23

২৭ ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ৬৪।

২৮ *প্রাগুক্ত*, ৬০-৬৬; Major B.D.Basu, *Ruin of Indian Trade and Industries*, 52-53।

২৯ *The Imperial Gazetteer*; A *General Dictionary of Geography*, 479.

৩০ মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২৫৩।

৩১ সিকদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিবর্তন*, ৬৩।

৩২ সালাহউদ্দীন আহমেদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫*, (ঢাকা: ইউপিএল, ২০০০), ১৮।

৩৩ Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*, (Princeton: Princeton University Press, 1993), 151-174.

৩৪ Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: the 'manly Englishman' and the 'effeminate Bengali' in the late nineteenth century*, (Manchester: Manchester University Press, 1995), 127-135.

৩৫ শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* ২৯৬।

৩৬ *প্রাগুক্ত*, ৩০৩।

৩৭ *প্রাগুক্ত*, ২৯৭।

৩৮ এরকম উদাহরণ- 'Yesterday vesper a great hurricane the valves of the window not fasten great trapi- detion and palpitation and then preciptated into the precinct, God grant master long long life and many many posts. P.S. No tranquility since valve broken. I have sent carpenter to make reunite, etc.' *প্রাগুক্ত*, ৩০৩।

৩৯ Sinha, *Colonial Masculinity*, 129.

৪০ মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* , ২৬৭-২৬৯।

৪১ শ্রীপান্থ, *কলকাতা*, ৩০৫।

৪২ আহমদ শরীফ, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), ১৯২-১৯৩।

৪৩ Chatterjee, *The Nation and Its Fragments*, 23-58.

৪৪ শ্রীপান্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৩০৫।

৪৫ S. N. Mukherjee, *Calcutta: Myths and History*, (Calcutta: Subarnarekha, 1977), 1-60.

৪৬ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, (কলকাতা: এ. মুখার্জী এন্ড কো. প্রা. লি., ১৯৭৫), ১৪৩-২৩৫।

৪৭ মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২৬২।

৪৮ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ*, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), ১৪-১৬।

৪৯ শ্রীপান্থ, *কলকাতা*, ২৯৯।

৫০ *প্রাগুক্ত*, ৩০০।

৫১ Sinha, *Colonial Masculinity*, 17-19.

৫২ শ্রীপান্থ, *কলকাতা*, ৩০৬।